পঞ্চম অধ্যায়

বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতায় বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন

প্রাচীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের যে বিশাল বিস্তৃতি, মহারাজ হর্ষবর্ধন-এর পর তা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। কপিলাবস্তু, কুশীনারা, শ্রাবস্তী বা সারনাথ ইত্যাদি স্থানগুলি ভারতবর্ষের কোথায় অবস্থিত[১] বা বৌদ্ধধর্মের আর একটি শাখা মহাযান পন্থীদের বিবর্তন বা বিকাশ সম্পর্কে কোনো তথ্য উনিশ শতকের পূর্বে কেউই জানত না।[২] কালের গর্ভে এসবও যেন নির্বাণপ্রাপ্ত। যদিও ষোড়শ শতক থেকে পতুর্গিজদের মাধ্যমে ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির থেরবাদী বা হীনযানপন্থী বৌদ্ধধর্মের বিবরণ অল্পবিস্তর ইউরোপে পৌঁছেছিল। বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত স্তানিশ্লা জুলিহন (Stanislas Julien) হিউএন সাঙ রচিত 'ভারত ভ্রমণ' বিবরণ চিনা ভাষা থেকে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন — এরকম এক অন্ধকার সময়ে। আর তারপরে পরেই আলেকজাণ্ডার কানিংহাম-এর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে গড়ে ওঠে 'আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'। হাঙ্গেরির বিখ্যাত পণ্ডিত আলেকজাণ্ডার চোমা দ কোরেস[৩] (Alexander Csoma De Koros) এবং ব্রায়েন হটন হজসন[৪] (Brian Haughton Hodgson) এই সময় এশিয়াটিক সোসাইটিতে বৌদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে চর্চার আগ্রহে উপস্থিত হন। চোমা তিব্বতে এবং হজসন কুমায়ুন ও কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছন। এঁদের প্রচেষ্টায় মহাযান মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারেন পণ্ডিত সমাজ। এর পরে পরেই ভারতীয় পণ্ডিত সমাজ বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে চর্চা শুরু করেন। কেবল পালি ভাষায় নয় বৌদ্ধধর্ম – দর্শন, সংস্কৃতেও প্রচুর বৌদ্ধশাস্ত্র লেখা হয়েছে আর ভারতবর্ষে লুপ্ত হলেও এই ধর্ম – সাহিত্য নেপাল ও তিব্বতে আজও গচ্ছিত – একথা জানতে পারলেন ভারতীয় পণ্ডিত সমাজ। আর তারপর গবেষণা ও শিল্পসাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছাপিয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে ফ্রিডরিখ ম্যাক্সমুলার, ইউজিন বুনুর্ফ, হেরমান ওল্ডেনবার্গ প্রমুখ বিদেশী ভারততত্ত্ববিদদের সঙ্গে বাঙ্গালী রাজেন্দ্রেলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, শরৎচন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু, চারুচন্দ্র বসু প্রমুখর নামও স্মরণীয়। সিপাই বিদ্রোহের পর এই চর্চা আরো বিস্তৃত হয়। কেননা আমাদের দেশে যে জাতীয়

জাগরণ শুরু হল, তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাচীন ভারতের প্রতি অনুরাগ। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার (১৭৮৪) পর প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি নানাধর্মের সারসত্য নিয়ে অসাম্প্রদায়িক উদার মানবধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিতে শুরু হল ভেদাভেদ দূর করে লোকহিত প্রতিষ্ঠা করা। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় এই রকম মানসিকতার কারণে ১৮২৮ সালে 'বজ্রসূচী' নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করেন। রামমোহন জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লেখেন; 'রামমোহন যে বজ্রসূচীর অনুবাদ করেছেন তাতে রয়েছে জাতিভেদের নিন্দা।[৫]'

বলাবাহুল্য, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক কারণে গোটা ব্রাহ্মসমাজ গৌতম বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বুদ্ধচর্চা অব্যাহত রেখেছিল। এবং এই পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর প্রবেশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, গান, নাটক এবং প্রবন্ধে বৌদ্ধ সংস্কৃতি একটি বিশেষ আসন দাবী করে। বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে অনেক কবিতা লিখেছেন তিনি। সে সবের কিছু কিছু পরবর্তীকালে নাটকেও স্থানান্তরিত। কিন্তু একজন কবি বা শিল্পী ঐতিহ্য বা পুরাণকে অবশ্যই গ্রহণ করবেন — আবার ঐতিহ্য ভেঙে নতুন ঐতিহ্যের নির্মাণও করবেন। মাইকেল মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখতে গিয়ে রামায়ণ কথাকে সম্পূর্ণ বদলে দেন। তাঁর 'বীরাঙ্গনা'ও পুরাণকারদের পৌরাণিক মহিলা নয়। আলোকপ্রাপ্তি বা নবজাগরণকালের নারী। তাঁদের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আজও সমান তৎপর। জীবনানন্দ দাশ পরবর্তীকালে লেখেন 'রূপসীবাংলা'। সে বাংলা কিন্তু জন্মভূমি নয়, সে বাংলা বঙ্গজননীর প্রেমিকামূর্তি।[৬]

এর মাঝে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কখনোই বুদ্ধ বা তার ধর্মকে নিছক অনুসরণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধদের ব্রহ্মবিহারের সঙ্গে উপনিষদের ব্রহ্মকে মিলিয়ে নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছেন। ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আস্তিক। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী। তাই তাঁর পথ কখনোই বুদ্ধদেব – অনুরূপ সম্ভব নয়। তাঁকে বলতে হয়:

''বুদ্ধদেব শূণ্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। কিন্তু তিনি মঙ্গল সাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকার ত্যাগ ক্রোধ ত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা।''[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধবাদের নঞর্থকতাকে গ্রহণ করেননি। সদর্থক বা ইতিবাচক

দিকটিকেই হৃদয়ে ধারণ করতেন। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে একদা লিখেছেন :

> "যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই।...
>
> আমি বলি যা হয়েছে বেশ হয়েছে, এই যে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্যজগৎ হয়েছে; বড় তোফা হয়েছে – এমন জিনিসটা নষ্ট না হওয়াই ভালো।'[৮]

রবীন্দ্রনাথ নির্বাণতত্ত্ব মানেননি। মানেননি বৌদ্ধধর্মের শূণ্যতা। তিনি এই ধর্মে খুঁজে পেয়েছেন প্রেম ও মৈত্রীভাবনা।[৯] তাঁর রচিত কবিতা ও নাটকগুলি এই ভাবনার লক্ষণরেখা অতিক্রম করেনি কখনো।

পৃথিবীতে কোনো মহৎ প্রতিভা ঐতিহ্য বা ইতিহাস বা পুরাণকে অবিকল অনুসরণ করেন না। এর আরো অধিক প্রমান প্রাচীন ভারতবর্ষের সম্রাট অশোক। তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেও রাজ্যশাসনে কিছু ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে একমত নন। তাঁর লেখগুলিতে নির্বাণের কোনো উল্লেখ নেই। বরং সেখানে ধর্মাচরণের জন্য ইহলোক সুখ এবং পরলোকে শান্তি – এমন হিন্দু বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। পরলোকে 'সুখের' পরিবর্তে তিনি 'স্বর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'ধর্ম্মপদে' নির্বাণ ও স্বর্গের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আসলে অশোক ব্যক্তিগতভাবে বৌদ্ধ হলেও তাঁর রাজ্যশাসন ছিল একটি নৈতিক ধারণা। এবং স্বকীয় আবিষ্কার। এই 'ধম্ম' হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাবধারার নিকট ঋণী হলেও – একটি ব্যবহারিক, সুবিধাজনক এবং নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সুস্থ জীবনযাপন পদ্ধতি নির্দেশের প্রয়াস।[১০]

কোনো মহৎ শিল্পী অথবা প্রতিভা হুবহু ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেন না। এই ধারায় বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতাকেও বিচার করা যায়।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য প্রথম জীবনে চর্যাগানগুলি অনুবাদ করেছেন আধুনিক বাংলা ভাষায়।[১১] তাঁর সম্পাদিত 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা' সংকলনে চর্যার কিছু অনুবাদ আছে। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে অর্থাৎ ২০১০ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দু-দিন ব্যাপী একটি বক্তৃতা দেন 'চর্যাপদ: ফিরে দেখা'।[১২] এখানেও বেশ কিছু চর্যাগানের অনুবাদ আছে। কিন্তু এই অনুবাদ বা চিনা জাপানি কিংবা তিব্বতি ভাষা চর্চা প্রমাণ করে না, বীতশোক ভট্টাচার্য বোদ্ধবাদী। জীবনের মধ্যভাগে তিনি জেন কবিতা ও গল্পের অনুবাদও করেছেন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ঢঙে। এ নিরাসক্তি তিনি কিশোর বয়স থেকেই অর্জন করেছেন অজস্র পাঠের

মাধ্যমে। কোনো বিশেষ একটি বৃত্তে আটকে পড়েননি। তাই অজস্র প্রেমের কবিতা, গার্হস্থ্য জীবনের লোভাতুর ছবি, হতাশাময় দিনান্তের কথা তাঁর লিখনে পাওয়া যায়। কিন্তু সবই নির্মোহ। এই নির্মোহরূপ সহজ সাধকদের ছিল, ছিল জেন সাধকের মধ্যে। কিন্তু তাঁরা একটি ধর্মের বাঁধনে বাঁধা। কবি বীতশোক-এর এমন কোনো বন্ধন নেই। বন্ধন নেই বলেই এমন নির্মোহ অনুবাদ করেন তিনি কাহ্নুর একটি পদ :

'বামে দাহিনে গুম ঘাট।
ভনই কাহ্নু অন্তরালেঁ বাট।।'[১৩]

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য এই পদটির অনুবাদ করেন চারটি পঙ্‌ক্তিতে —

'বাঁ পাশে গুল্মের দিকে ছায়া টেনে নেয় এক সৈনিক শিবিরে,
দক্ষিণে ঘাটের কাছে স্নিগ্ধ এক ঘাঁটি আছে শুল্ক সংগ্রহের;
এসব সমস্ত জেনে কিন্তু তবু কেন কাহ্নু ভনিতা করেছে :
এসো, এসো, আছে পথ; পথ আছে মধ্যবর্তী, ভিতরে যাবার।'

এই প্রকীর্ণ চর্যা সম্পর্কে বীতশোক ভট্টাচার্য তাঁর 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা'র 'পরিচায়িকা' অংশে লেখেন:

'কবিতাটির ভাষান্তরে স্বাধীনতা নেওয়ার দরকার ছিল। গুম ঘাট হলো গুল্ম-ঘাঁটি। বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে সীমান্তরক্ষী থাকতো না, গুল্ম ছিল স্থানীয় থানা। উদাসীন গ্রাম থেকে শুল্ক আদায় এর কাজ ছিল। বনের পারে আর নদীর ধারে এরা থানা গেড়ে বসতো। বৈষ্ণব পদাবলীর দানখণ্ড নৌকাখণ্ড পালায় কৃষ্ণের অত্যাচারের বীজ আছে এখানে। কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনী এদের জন্য ক্রমে দূর্বল হয়ে পড়ে এবং তুর্কদের বঙ্গবিজয়ের পথ প্রশস্ত হয়।'[১৪]

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য যদি বৌদ্ধ বা সহজসাধক হতেন তাহলে 'অন্তরালেঁ বাট' নিয়েই পাঁচপাতা লিখতেন। আসলে তিনি ভারতবিদ্যার পাঠক।[১৫] তাই কবিতাটির অনুবাদে ভারত ইতিহাস খুলে ধরেছেন আর 'পরিচারিকা' বা টীকায় তাকে আরো বিস্তৃত করেছেন। এবং এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একথা সত্য, বীতশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাংলা কবিতার কোনো সংকলনে এই প্রথম চর্যার পদগুলি স্থান পেল। এ প্রসঙ্গে সম্পাদকের 'প্রাসঙ্গিক' উক্তি স্মরণীয়:

''কয়েকটি দিক থেকে পূর্ববর্তী সংকলনগুলির সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ার মতো। প্রথমত,

বাংলা কবিতার প্রাচীন পর্যায়টিকে সকলে সুনির্দিষ্টভাবে বর্জন করেছেন। এতে কালগতভাবে বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের কয়েক শতক যে শুধু খণ্ডিত হয় তা নয়। এটি শুধু বাংলা নয়, নতুন ভারতীয় আর্য-ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম দলিল। ... মার্কিন ইন্ডিআন কবিতা। তার গহন ক্রিপ্টিক স্বভাব নিয়েও যেমন ইংরেজি অনুবাদে টীকাভাষ্যসমেত গ্রাহ্য, সন্ধ্যাভাষী চর্যাগানও তেমনি। বাংলা কবিতার ইতিহাসকে আদ্যন্ত অঙ্গীকার করে এ সংকলন তৈরি।''[১৬]

'জেন গল্প' ও 'জেন কবিতা'ও প্রকাশিত হয়েছিল পিঠোপিঠি সময়ে। ১৯৮৮ এবং ১৯৯০।[১৭] এর পেছনেও কোনো ধর্মদেশনা ছিল না।[১৮] এজরা পাউণ্ড যে নিরাসক্তি নিয়ে প্রাচীন চিনা কবিতার অনুবাদ করেছেন এবং আঙ্গিকগত দিক থেকে যেভাবে নিজের কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন, বীতশোক ভট্টাচার্যর প্রয়াসও তাই। জেন গল্প, কবিতা থেকে তিনি তুলে নিয়েছেন নির্যাস। এবং এই নির্যাস তাঁর কবিতার গঠন ভঙ্গিমায় চারিয়ে গেছে। কবিতা পেয়েছে ঋজু-স্বভাব, মিতকথন, নৈর্জন্য পেরিয়ে নৈঃশব্দ – যাকে বিভাজন করা যায় না; আর এ বিরাট নিঃশব্দের মাঝখানটিতে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেয়; মন্ত্রের মতো ঘণ্টাধ্বনির মতন কিছু শুনে চলবার সঙ্গী হওয়ার ডাক পাঠায়। এ প্রসঙ্গে 'জেন' নামের কবিতাটি তুলে ধরা যেতে পারে।

'সেবার এক বৌদ্ধমঠে উঠে
আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছিল।
পুরোহিতকে আমি ইংরাজিতে
বলেছিলাম : জল কোথায়, বলো।

ইয়া। যেন মন্ত্র একাক্ষরে।
দেখাল এক গভীর নলকূপ।
চাপ দিয়েছি কোথায় জল ঝরে।
ক্ষুব্ধ ফিরি পুরোহিত সেই চুপ।

জল নেই কি : প্রশ্নের উত্তরে
একাক্ষরে, নো। ও ডুব দিল
নীরবতায়। এবং তারপরে
জানার আমার আর কী ছিল বলো।' ('জেন', 'নতুন কবিতা)'

কবিতাটি সামান্য ঘটনাকেন্দ্রিক; নাটকীয় হয়েও মিতসংলাপী। গোটা কবিতায় বৌদ্ধ ধর্মের অনুষঙ্গ ছড়িয়ে আছে। আরো আছে জেন বুদ্ধবাদ কী তা জানার প্রয়াস। বৌদ্ধমঠ, তৃষ্ণা – শব্দ দুটি আমাদের খুব পরিচিত। তৃষ্ণা বা তন্‌হা থেকে মুক্তি বা নির্বাণ। এ কবিতাতেও নির্বাণ ধারণাকে বোঝানো হয়েছে। নলকূপ শব্দটি দুটির সমন্বয়। নল+কূপ। এখানে আমাদের মনে পড়ে নলপান জাতক[২০] গল্পটির কথা। উদক রাক্ষসকে এড়িয়ে কপিরূপ বোধিসত্ত্ব নলের সাহায্যে সরোবরের জলপান করে গোটা বানর সমাজকে বাঁচালেন কীভাবে — তার আখ্যান নলকূপ শব্দটির মাধ্যমে আভাষিত। এখানেও নলের সাহায্যে জলপানের ইচ্ছা এবং ব্যর্থতা। পালিভাষায় কূপ শব্দের অর্থ কুয়া বা জল আছে বা নেই এমন গহ্বর। তাছাড়া অজ্ঞান মানুষজন যারা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে কিছুই বুঝতে চায় না – সেই তাদেরকে কূপমণ্ডুক বলা হয়। যে মানুষটি ইংরিজিতে পুরোহিতকে জল কোথায় প্রশ্ন করেন আবার গভীর নলকূপে চাপ দিয়ে জল না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ফেরেন এবং প্রশ্ন করেন, জল নেই কি – তিনি সামান্য হলেও কূপমণ্ডুক। চর্যাগানে এদেরকে মূঢ়া (১৫, ৪২) মূঢ় (৪৫)[২১] ইত্যাদি বলা হয়েছে।

কবিতাটিতে দুটি ইংরিজি শব্দ আছে: ইয়া অর্থাৎ ইয়েস বা হ্যাঁ এবং নো অর্থা না। কিন্তু প্রথাগত অর্থের বাইরেও শব্দ দুটির ভিন্ন অর্থ থাকে। পালিভাষায় নো – না সূচক অব্যয়। আবার এটি বিরোধ বা বৈপরীত্য অর্থেও প্রয়োগ করা যায়। ইয়া শব্দটির খুব কাছে, প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ ইহা / ইহ যার অর্থ ইহলোক। বর্তমান অস্তিত্ব বা এই জগৎ। তাই বাস্তব জগৎ থেকে কবিতাটি বিপরীত দিকে এগুতে চায়, মূঢ় ব্যক্তি তাকে ধরতে পারে না। শব্দদুটিকে কবি একাক্ষর মন্ত্র বলেছেন। একাক্ষর হিন্দুদের মন্ত্র: ওঙ্কার। এক ব্রহ্ম যাঁর প্রতিপাদক। একাক্ষর বলতে আবার একটি অক্ষর বা বর্ণও বোঝায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে পাই :

মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাঁহী। / একই আখরে মো বুঝিলোঁ তোর ঠাঁই।। সন্ধি করলে হয় এক+আখর = একটি অক্ষর। অতি সংক্ষেপও বোঝায়। যা বড়ু চণ্ডীদাস বুঝিয়েছেন। কীর্তন গানে মাধুর্য্য ও ভাব বৃদ্ধির জন্য যখন আরো কিছু পদ গাওয়া হয় – তাদেরকে অর্থাৎ ঐ পদগুলিকে আখর বলে।

কবিতাটি দুটি একাক্ষর থেকে অন্য আখরে চলে যেতে চায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিল পেয়েছিলেন।[২২] এখানে একাক্ষর মন্ত্রে এমন ভাবনার সঙ্গে মিলিত হয়েও কবিতাটি ভিন্ন কিছু বলতে উন্মুখ। যাঁরা জেন ধর্ম সাধনা করেন, এ কবিতা সেদিকে যেতে চায়।

এ প্রসঙ্গে বীতশোক ভট্টাচার্য নিজে বলেন:

একটু দীর্ঘ হলেও সে লিখন এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য:

"জেনবাদ নিজেকে আঘাতে আঘাতে বেদনায় জাগিয়ে তোলার জন্য। না ধূপ না দীপ না মন্ত্র না নৈবেদ্য জেন সাধকের কিছু লাগে না। জেনের কোনো আশ্রয় নেই। জেন কোনো নির্ভর চায় না। জেনবাদী জানেন: টোকা নয় ধাক্কা দিলেই আচমকা দরজা খোলে। তোরণ নেই, এমন এক তোরণ সহসা, উন্মুক্ত হয়ে যায়। তিনি জেনবাদকে বুদ্ধ হৃদয় বলেন, তাঁর প্রিয়তম পুঁথি লঙ্কাবতার সূত্র। হয়তো ধ্যানঘরে বসে শীতের রাতে জেনসাধনা করছেন, জ্বালানি নেই, আগুন নিবে আসছে, হি হি হাওয়ায় মনোযোগ ভেঙে যাচ্ছে। জেন সাধক কুলুঙ্গি থেকে কাঠের বুদ্ধমূর্তিটি আগুনে ছুঁড়ে দিলেন, খানিকটা ঝিকিয়ে উঠে আগুন আবার ম'রে এলো। আর হাওয়া ছুটে এলো হু হু করে। জেন সাধক লঙ্কাবতার সূত্রটি ছুঁড়ে দিলেন, ঝলসে উঠে আগুন তখনই খেয়ে ফেললো পাতা, পুঁথির পাটা, তারপরই নিবে আসতে থাকলো। এবার উঠলেন জেন সাধক, ধ্যান ঘরের দেওয়াল থেকে দু-চারটে তক্তা তুলে এনে আগুনে নামিয়ে ঠেলে দিলেন, ফের সমাহিত হলেন নিস্পন্দ, নিশ্চিন্ত। এবার প্রবাহিত হও উত্তরের হাওয়া, যদি ইচ্ছা হয়। জেন সাধক ধ্যানস্থ হয়েছেন। অথবা অন্য কাজ করছেন। মা যেমন গর্ভের শিশুকে সচেতন বা অচেতনভাবেও বিপদ থেকে রক্ষা করে বেড়ান তিনিও তাঁর চিত্ত পোষণ করে চলেন।"[২৩]

দীর্ঘ এই উদ্ধৃতির পর কবিতাটি কিছু বোধগম্য হবে হয়তো। কেননা, কবিতাটি হেঁয়ালির মতো।[২৪] কেননা হ্যাঁ (ইয়া) এবং না (নো) – তাতে পাঠক ভিরমি খায় কিংবা ভাবে, এ একটি – শিশুপাঠ্য ছড়া। তাছাড়া, যিনি এই দুটি একাক্ষর উচ্চারণ করছেন — তাঁর কোনো দয়া বা ভালোবাসা নেই তৃষ্ণার্ত মানুষটির প্রতি। আর মানুষটিও হিউমার ব্যবহার করলেন: "এবং তারপরে / জানার আমার আর কী ছিল বলো।" এই বাক্যে কান্না ও হাসি মিশে আছে, ধরা রয়েছে অনেক কিছু। পারগত হওয়ার নিদান।

আসলে জেনসাধক শিষ্যদের ধাঁধাঁ লাগনো প্রশ্ন দেন : এক চুমুকে নদীর জল খেয়ে নাও তবে বুঝতে পারবে। প্রশ্ন এবং পরিপ্রশ্নে ব্যাকুল করে তোলেন শিষ্যকে। একে বলে কোয়ান। এই প্রশ্নের ধাক্কায় শিষ্য অনুভব করেন সটোরি। অর্থাৎ উত্তর বা জেন। গুরুদেব শিষ্যকে জেন শেখাতে পারে না। জলে না নামলে কেউ যেমন সাঁতার শিখতে পারে না, তেমনি নিজেকেই

জেন শিখতে হয় বা অনুভব করতে হয়। বর্তমান কবিতার মানুষটি হয়তো নিজে নিজেই জেন সাধক হলেন। কেন না, ক্ষুব্ধ তিনি হিউমারের আশ্রয় নিলেন, কোনো ক্ষোভ প্রকাশ বা রাগে ফেটে পড়লেন না।

আসলে, গোটা কবিতাটি একটি সন্ধ্যাভাষ অথবা সন্ধ্যাবচন কিংবা সংকেত।[২৫] এখানে বিশেষ কোনো শব্দ নয়, ঢেন্ঢন পা-এর কবিতার মতো রহস্য স্পষ্ট নয়, রহস্য রইল এর ভেতরে : 'যো এথু বুঝএ সো এথু বীরা'। তাছাড়া কবিতাটির অন্তে মিল রইলেও গদ্যভাষায়ও পড়া যায়। গদ্যে আমরা ক্রিয়াপদকে বাক্যের শেষে স্থান দিই। এ কবিতায়ও তাই ঘটেছে। গদ্য ও পদ্যের মধ্যে কবিতাটি যেমন চলনশীল তেমনি ধাঁধাঁ ও কবিতার মধ্যে বিনিময় ঘটছে অবিরল। চর্যা আর জেন এখানে পরিপূরক। 'কোথায় জল ঝরে' — তাকে খুঁজতে ব্যস্ত পাঠক। কবিতাটি জলের মতো তরল বা সরল শুধু উপর স্তরে, কিন্তু গভীরে অনিশ্চিত কুটিল; স্রোতে, প্রতিস্রোতে, আবর্তে নিত্য মথিত; আরো গভীরে ঝড়ের জন্মস্থল, আর হয়তো – এমন কি – খরদন্ত মকর – নক্রের দুঃস্বপ্ন-নীড়।[২৬]

প্রথম থেকে বীতশোক ভট্টাচার্য বৌদ্ধধর্ম এবং চর্যাগীতির তন্নিষ্ঠ পাঠক[২৭] ছিলেন। তাই তাঁর কবিতায় বৌদ্ধধর্মের উল্লিখন ফিরে ফিরে আসে। সেই সূত্রেই যে কোনো পাঠক তাঁকে বুদ্ধবাদী মনে করতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি সে রকম নয়। তিনি বৌদ্ধধর্মকে ভেঙে শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে এগিয়েছেন সরাসরি। অনুবর্তন তাঁর কবিতায় তুমুল হলে তিনি অনুকারী হতেন মাত্র, খাঁটি শিল্পী হতে পারতেন না। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করা যায়।

'বোধি গাছের তলা থেকে উঠে এসেছেন বুদ্ধ।
অজপাল গাছের তলা থেকে চলেছেন মুচলিন্দ গাছের তলার দিকে।
উরুবেলা থেকে বারাণসীর দিকে চলতে চলতে
এসে পড়েছেন ঋষিপত্তন মৃগদাবে।

আজ তাঁর গুরুদেব আর কেউ নেই।
তাপস আলার কালাম গত হয়েছেন।
সাধক রুদ্রক প্রয়াত।
বুদ্ধ উপদেশ করবেন পুরোনো পাঁচ শিষ্যকে।

এখন কৌণ্ডিন্য ও অশ্বজিৎ
মহানাম, বাষ্প ও ভদ্রিয় পরস্পরকে বলছেন :
ঐ আসছে অমিতাহারী গৌতম।
ওকে কোনও অভ্যর্থনা নয়।
ওকে কোনও সংবর্ধনা নয়।

কিন্তু কৌণ্ডিন্য এগিয়ে নিলেন বুদ্ধের পাত্র চীবর।
অভিবাদন করলেন ভদ্রিয়।
আসন পেতে দিলেন অশ্বজিৎ।
বাষ্প পা ধোয়ার জল এনে দিলেন।
আর তথাগতকে বন্ধু বললেন মহানাম।
বুদ্ধ বললেন :
না অর্হৎ কারও বন্ধু নন।
দুঃখের কারণ চরম কৃচ্ছ্রসাধনা।
সুজাতার রূপের ভেতর তার আত্মা ছিল না।
আত্মা ছিল না সুজাতার পরমান্নের ভেতর।
সুজাতার রূপকে তাই অধিকার করতে পারিনি আমি।
সুজাতার পায়েসকে তাই অধিকার করতে পারিনি আমি।
কেন না আমির ধারণাই সত্য নয়।'[১]

তবু একথা মিথ্যা নয় :
সুজাতার হাতের পায়েস খেয়ে বেঁচেছিলাম আমি।
তাই, ভিক্ষুরা, আজ তোমাদের দেব অমৃত।'[২৮] ('বোধি', 'প্রদোষের নীল ছায়া')

কবিতাটি বিশেষ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। গৌতম-এর বুদ্ধত্বলাভ এবং প্রথম পাঁচ শিষ্যের নিকট ধর্মচক্র প্রবর্তন। তত্ত্ববোধ হওয়ার পর প্রথম সাতদিন বোধি বৃক্ষের তলায় বসে মুক্তি সুখের আস্বাদ নেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে অজপাল অর্থাৎ নগ্রোধের তলায় কাটান, তৃতীয় সপ্তাহে মুচলিন্দ বৃক্ষের তলে এবং চতুর্থ সপ্তাহে– রাজায়তন বৃক্ষের তলায় কাটিয়ে

আবার ফিরে আসেন অজপালের তলায়। আর এখানেই তিনি মনস্থ করেন, এই তত্ত্ব সাধারণ মানুষদের জানানো উচিৎ। এই বাসনায় আষাঢ় পূর্ণিমার পূর্বে বারানসীর পথে পৌঁছেন ঋষিপত্তন মৃগদাব বা সারনাথে। ওখানে তখন থাকেন, একদা গৌতম এর সতীর্থ, পাঁচজন বা পঞ্চবর্ণীয় ভিক্ষু। গৌতম একদা এঁদের ত্যাগ করেছিলেন। এঁরা গৌতমকে দূর থেকে দেখে চিনতে পেরে উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবে পারেননি। এঁদেরকে নিয়ে হল প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য এই তথ্যগুলি কবিতার প্রথমেই রেখেছেন। কিন্তু বুদ্ধের মুখে যে কথাগুলি বসিয়ে দিয়েছেন, সে সব কথা বুদ্ধ কখনোই বলেননি। বুদ্ধ তাঁদের বলেছিলেন, চারটি আর্যসত্য এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা।[২৯] এমন কী প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের কথাও বোধ হয় বলেননি।[৩০] আর যদি বা তা বলে থাকেন তা পরবর্তীকালের দার্শনিকগণের জটিল মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। কেননা, জনসাধারণ জটিল তত্ত্ব বুঝতে চায় না। এটা চিরকালীন সত্য।

বুদ্ধ বলেন, তৃষ্ণা বা তন্‌হা দুঃখের কারণ। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের বুদ্ধ বলেন, দুঃখের কারণ চরম কৃচ্ছ্রসাধনা। রূপ বা আত্মাকেও বুদ্ধদেব স্পষ্টত স্বীকার করেননি। অথচ এ কবিতায় সেই রূপ বা আত্মাকে অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যা বুদ্ধ পারেননি, এমন অক্ষমতার প্রকাশ স্পষ্ট।

'দুঃখের কারণ চরম কৃচ্ছ্রসাধনা' — বললে আমরা গৌতমবুদ্ধের কৃচ্ছ্রসাধনজনিত শরীর দেখতে পাই।[৩১] কিন্তু কবি এই কৃচ্ছ্রসাধনাকে কেবল ভিক্ষুর শরীরে সীমাবদ্ধ রাখেন না, কৃচ্ছ্রসাধনাকে আরো ব্যাপ্তি দেন। মনের মধ্যে যে কোনো তৃষ্ণার লালনই কৃচ্ছ্রসাধনা। এই কৃচ্ছ্রতা তাকে আরো চাই আরো চাইরূপ দৌড়ুতে সাহায্য করে। তাই কবি কৃচ্ছ্রসাধনাকে একটা বিশালতায় নিয়ে তোলেন। তেমনি 'আত্মা' শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে নিজ বা স্ব যেমন থাকে তেমনি আছে মন। সুজাতার রূপের ভিতর আত্মা নেই অর্থাৎ সেই কামনা-বাসনা-সম্ভব মানবিক মন ছিল না। সুজাতা বৃক্ষদেবতা ভেবেই অন্নদান করেন। নিঃস্বার্থ বা স্বার্থরহিত তার রূপ তখন। সে রূপের মধ্যে মানবিক অস্তিত্ব অনুপস্থিত। সুজাতার দেওয়া পায়েস তো জড়বস্তু। জড়ের তো মন বা আত্মা হয় না। তাই সেই অন্ন আমি কেনই বা অধিকার করব ? 'আমি' ধারণাই হয় না। বৌদ্ধধর্ম সংঘ এবং ধর্মকে স্মরণ করে।

এ কবিতার মোট পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ২৯। তার মধ্যে ২৪ এবং ২৫ পঙ্‌ক্তির শেষে 'পারি নি

আমি' শব্দটি নঞর্থক।২৬ পঙ্‌ক্তির বাক্য : 'আমির ধারণাই সত্য নয়'। তাহলে, যে 'আমি' সত্য নয়, সেই 'আমি' কেনইবা 'অধিকার' করতে চায় ? 'অধিকার' করতে 'আমি' চেয়েছে — তার প্রমাণ 'পারিনি' শব্দ দুটি। 'না' একটি ভিন্ন পদ। 'নি'ও তাই। কিন্তু 'না' বললে যতটা জোর দিয়ে কথা বলা হয়, আলাদাভাবে 'নি' বললে তত জোর দেওয়া হয় না। কেননা, হ্রস্ব-ই ধ্বনিটি তার কারণ। এই কারণে পূর্বজ পণ্ডিত বা মনীষীগণ 'নি'কে অযোগবাহ বর্ণের মতো গ্রহণ বা ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখতেন 'পারিনি'। এখানে কবি 'নি'কে আলাদা পদের মর্যাদা দিয়ে বুদ্ধের মানবিক অস্তিত্বটিকে স্পষ্টতা দেন। যে বুদ্ধ বলেন 'আত্মা'র কথা, সেই বুদ্ধ বলেন অধিকারের কথা অত্যন্ত দুর্বল স্বরে 'পারি নি'। মানুষের দুর্বলতা যেন তাঁর কণ্ঠস্বরে। হতাশাক্লিষ্ট প্রেমিক অথবা মানুষ!

আপাতভাবে কবিতাটি পড়লে বুদ্ধবাদীদের বা ধর্মের পক্ষে বলেই মনে হবে। কোনো বিরোধ নেই। কেন না, বুদ্ধদেব আত্মা সম্পর্কে নীরব থাকতেন।[৩২] পরবর্তীকালে তাঁর এই নীরবতাকে মৌনের সম্মতি ভেবে আত্মাবাদ বৌদ্ধধর্মে গৃহীত হয়।[৩৩]

তাই কবিতাটি আত্মা বা রূপকে যেমন মেনে নেয়, তেমনি এসব থেকে ভিন্ন পথেও উজিয়ে যায়। হয়তো, একেই বলে, শিল্পীর স্বাধীনতা।

কবিতাটি চলনশীল। অর্থাৎ দুটি প্রান্তে ঘোরাঘুরি করে। এক প্রান্ত ধর্ম, অন্য প্রান্তে মানুষের রক্ত মাংসের জীবন। বুদ্ধ নিয়েছেন মধ্যপন্থা। এ কবিতায় ১১ পঙ্‌ক্তিতে বলা হয়েছে :

'ঐ আসছে অমিতাহারী গৌতম'। 'অমিতাহারী' শব্দটির অর্থ যে অমিত অর্থাৎ নয় মিতআহার করে। এই আহার বেশি অথবা কম হবে কিন্তু কখনোই মিত নয়। পঞ্চবর্গীয় শ্রমণগণ নিশ্চয় সুজাতার দেওয়া অন্নভক্ষণের কথা জানতেন। যা তার তপস্যাকে নষ্ট করেছে। কিন্তু না, শব্দটি মধ্যপন্থাকে ইঙ্গিত করছে। গৃহস্থাশ্রমের আরাম ও সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্রসাধন — এই দুয়ের প্রতিই নিষেধ ছিল বুদ্ধের। কবিতাটি তেমনি মধ্যপন্থী : রূপ, আত্মা থেকে ধর্মের উজানে চলনশীল। অথবা ধর্ম থেকে রূপ বা আত্মায় গমনশীল।

শেষ পঙ্‌ক্তিতে পাই, 'তাই, ভিক্ষুরা, আজ তোমাদের দেবো অমৃত।' বুদ্ধদেব এমন অহংকার কখনোই প্রকাশ করেননি। বিনয় তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দিয়েই কথা বলতে ভালোবাসতেন। এরকমভাবে নিজের জ্ঞানকে তিনি 'অমৃত'-র সঙ্গে তুলনা করতে পারতেন না। অথচ এখানে তা এসেছে। এসেছে দিত্ব থেকে। 'দেবো' শব্দটিতে অনুজ্ঞার

বানান বর্তমান। একে অহংকার ভাবা যায় আবার অনুজ্ঞাও ভাবা যায়।

ইতিহাস কবিতা নয়, কবিতাও ইতিহাস নয়। কিন্তু ইতিহাসকে আশ্রয় করে কবিতা রচিত হতে বাধা নেই। এ কবিতা তাই। এ জন্য এখানে থেকে গেল ব্যক্তি বুদ্ধ ও তথাগত বুদ্ধের দ্বন্দ্ব। ইতিহাস তখন নতুন রূপে রচিত হয়। ঐতিহ্য ভেঙে আবার নতুন এক ঐতিহ্যের সূচনা ঘটে। ব্যক্তি বুদ্ধ ও তথাগত বুদ্ধ স্থান পরিবর্তন করে। রূপ, আত্মা থাকুক, ধর্ম ও থাকুক। কেবল ধর্ম বা রূপ টাইপ মাত্র।

বীতশোক ভট্টাচার্য-র কবিতা বিশেষ কোনো ইজম বা ধর্ম বা কোনোরকম দায়বদ্ধতা থেকে শতযোজন দূরে অবস্থান করে। তাঁর অজস্র কবিতায় বুদ্ধ অথবা বৌদ্ধধর্ম, সংঘের পরিচিত ছবি বা শব্দ অথবা চিত্রকল্প উঠে এসেছে, কিন্তু তিনি কোথাও অন্ধের মতো অনুসরণকারী নন। তাঁর আরো একটি কবিতা আলোচনা করে প্রস্তাবিত মন্তব্যটিকে সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

‘এককালে মস্করী গোশালের শিষ্য ছিলাম আমি।
তাঁর মতো নিয়তিবাদী হতে পারলাম না, এই আমার নিয়তি।
ভালো লাগল না নগ্ন আজীবিকদের সঙ্গে আমৃত্যু মশকরা।

হলুদ ধটী পরে দেশে ফিরে এলাম, ভাবলাম অজাতশত্রু রাজাই জাতশত্রু।
ভালো লাগল না, আমাদের লিচ্ছবিবংশে রাজার সংখ্যা ৭৭০৭।
কেউ একবর্ণ সংস্কৃত জানে না, এইসব অসংস্কৃত রাজা।
ভাবলাম কষায় পরব, শরণ নেব সংঘের।
অবাক কাণ্ড, আশি বছরের বুদ্ধ আমাকে দিল উপসম্পদা;
আমি তার শেষ শ্রাবক।
তারপর সুগত গেল, ভাবলাম ভালোই হলো।
ভালো লাগল না অভিধর্ম নিয়ে আনন্দ আর উপালির বিতণ্ডা।

এবার আমার ধর্ম আমার কাছে।
ভেবে ফিরে গেলাম বৈশালীতে।
ভেবেছিলাম প্রৌঢ় বিট হয়ে কাটিয়ে দেব দিনগুলো।

কে বলেছে, বেশ করে তাই ওরা বেশ্যা।
রূপবান এক অনতিতরুণকে বারবার উলঙ্গ করেও ওদের ক্ষান্তি নেই।

ভাবছি তাহলে নগ্ন আজীবিকদের মধ্যে শান্তি আছে।
চাইলে ভিড়ে যাওয়া চলে দিগম্বর জৈনদের দলে।
হয়তো এতদিন মস্করী গোশাল বিগত, তার বন্ধু নাকি শত্রু মহাবীরও নেই
কিছুতে কিছু আসে যায় না, যাওয়া যায় গুরু সঞ্জয় বেলথিপুত্রের কাছে।
পকুধ-কাত্যায়নকে গুরু করে তার ককুদ নিয়ে খেলা করলে হয়।

কিংবা ফেরা যায় লিচ্ছবিদের মধ্যে;
অঙ্গে তোলা যায় বর্ম কবচ, মগধরাজের বিরোধিতার অঙ্গীকার।
জিতে এসে বিছানায় ডাকা যায় সন্তানের মাকে;
হেরে এসে সটান শুয়ে পড়া যায় শ্মশানে।
ভ্রূণ হয়ে ফেরা যায় জঠরে।
ভালো লাগে না, ব্রাহ্মণদের জমান্তরের ধারণায় আমার আস্থা নেই।"[৩৪]

('নির্গ্রন্থ', 'প্রদোষের নীল ছায়া')

বুদ্ধ এবং তাঁর সমকালীন ইতিহাসটাই এই কবিতায় উঠে এসেছে। ২৭ পঙ্‌ক্তিতে দীর্ঘ এই কবিতা প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বটিকে প্রকরণে গ্রহণ করে অতি সতর্কতার সঙ্গে, কিন্তু প্রকাশ্যে ঘোষিত চার্বাক বা লোকায়তিক দর্শন।

সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায় কার্যকারণ নিয়মকে বিশ্বপ্রক্রিয়ায় মূল সত্য বলে গ্রহণ করে। তখন বুদ্ধদেব পটিচ্চসমুপ্পাদ মত ঘোষণা করেন কার্যকারণ তত্ত্বকে উৎখাত করার জন্য। বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের নয়, প্রকৃতিও নয়, নিত্যস্বভাব অনু পরমাণুর দ্বারা গঠিতও নয়। বরং এই জগৎ নিত্য পরিবর্তিত একটা অস্তিত্বপ্রবাহ। প্রতীত্য সমুৎপাদের মূল কথা ইদপ্পচ্চয়তা বা ইদংপ্রত্যয়। অর্থাৎ একটি অস্তিত্ব প্রত্যয় নির্ভর করে অন্য বস্তু প্রত্যয়ের ওপর। 'ইতি ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, / ইমস্সুপপাদা ইদং উপ্পজজতি।' এটা হলে ওটা হয়। এর মধ্যে কোনো কারণ নেই অথচ কার্যকারণহীন ভাবে একটা অস্তিত্ব প্রবাহের মধ্যে ঘটছে অবিরল।[৩৫] নির্গ্রন্থ কবিতাতে

একটি প্রত্যয় থেকে আর একটি প্রত্যয় উপস্থিত। মস্করী গোশাল এবং সেখান থেকে নিয়তিবাদ, নগ্ন আজীবক, মশকরা, দেশে ফেরা, নিয়তি। অজাতশত্রু থেকে জাতশত্রু, লিচ্ছবিবংশ থেকে রাজার সংখ্যা, সংস্কৃত থেকে অসংস্কৃত, বুদ্ধ, সংঘ, উপসম্পদা, শ্রাবক — এভাবে কবিতাটি এগিয়েছে। আমরা এসবকে অনুষঙ্গ বলি। অনুষঙ্গ সূত্রে একটির পর একটি আগম।

প্রাচীন ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে বস্তুবাদী বা দেহাত্মবাদী মনোভাবের দর্শনও প্রচলিত ছিল।[৩৬] এ কবিতায় বুদ্ধের সমসাময়িক দর্শনগুলিকে নেতি নেতি করে পেরিয়ে ১২ থেকে ২৭ পঙ্‌ক্তিতে সেই প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

আসলে বীতশোক ভট্টাচার্যকে কেবলমাত্র বৌদ্ধ দর্শনের একনিষ্ঠ পাঠক এবং বৌদ্ধ প্রভাবের ভেতর কবিতাচর্চাকারী বললে তাঁর কবিত্ব এবং লেখক সত্ত্বাকেই অপমান করা হয়। তিনি ছিলেন ভারতবিদ্যার পাঠক এবং পথিক। ভারত বিদ্যার চর্চাকারী এই কবি তাই সব ধর্মদর্শন এবং শিশু সাহিত্যের ভেতর উজিয়ে গিয়ে নিজের কবিতায় নানা স্তর তৈরি করে শব্দ বা ভাষা সচেতনতার এক খেলায় মেতে কবিতায় ঘনিয়ে তুলেছেন অসম্ভব এক স্তব্ধতা। এই স্তব্ধতাকে খুঁজে পেতে অত্যন্ত জরুরী বিনির্মাণের দ্বারস্থ হওয়া।

তথ্যসূত্র

১। 'কুশীনগর' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বিভা' পত্রিকার আশ্বিন এবং অগ্রহায়ণ, ১২৯৪ সংখ্যায়। এখানে তিনি বিশদভাবে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহের ৪ খণ্ডে 'কুশীনগর' লেখাটি গৃহীত হয়। (ভারত সরকার স্থানগুলি সংরক্ষণ করতে গিয়ে কপিলাবস্তুকে লেখেন কপিলবস্তু, কুশীনগরকে লেখেন কুশীনারা ইত্যাদি)।

সম্পাদনা: সত্যজিৎ চৌধুরী ও নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৯,পৃ. ৪৭

২। সত্যজিৎ চৌধুরী , 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৯, পৃ. ৮৫।

৩। চোমাকে বলা হয় 'হারমিট হিরো ফ্রম হাঙ্গেরি'। তিনি মনে করতেন হাঙ্গেরির অধিবাসীদের আদি নিবাস ছিল মধ্য বা পূর্ব এশিয়া। পায়ে হেঁটে তিনি তিব্বতে পৌঁছন। এক লামার আশ্রয়ে থেকে তিব্বতি ধর্মীয় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তিব্বতি ভাষা শিখে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ৯ ফুট একটি ঘরে বসে দিনের পর দিন তিব্বতি পুঁথির অনুলিপি তৈরি করেন। ৩২০টি পুঁথির অনুলিপি প্রস্তুত করে কলকাতা ফেরেন। ১৮২৭ সালে আবার তিব্বত যান, এই সময় এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে অর্থ সাহায্য করেন। এবং ১৮৩১এ বিশাল এক পুঁথি নিয়ে যা বৌদ্ধশাস্ত্রের তিব্বতি অনুবাদ – ফিরে আসেন। তাঁর অমানুষিক পরিশ্রমে বৌদ্ধ ধর্মের নর্দান শাখা বা উদীচ্য ধারা অথবা মহাযান তথ্যভাণ্ডার গবেষকদের গোচরে আসে।

৪। ব্রায়েন হটন হজসন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে ১৮১৮তে ভারতে আসেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান পিপাসু মন তাঁকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করে। নেপালি বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে হজসন ১৮টি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর লেখায় প্রথম পাওয়া গেল বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবীর নতুন পরিচয়। তিনি কেঙ্গুর তেঙ্গুর গ্রন্থমালা সংগ্রহ করেন। কেঙ্গুর অর্থাৎ বুদ্ধবানীর তিব্বতি অনুবাদ। তেঙ্গুর হল বৌদ্ধতত্ত্ব বিষয়ে ভারতীয় ও তিব্বতি পণ্ডিতদের লেখার সংগ্রহ।

৫। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত'। দে'জ

পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২০২।

৬। নিতাই জানা, 'পোস্টমডার্ন' ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা পরিচয়,' পরিবর্ধিত সং ২০০৭, বাণীশিল্প, কলকাতা, পৃ. ৮০-৮৪।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,' রবীন্দ্র রচনাবলী' (৭ খণ্ড), বিশ্বভারতী, পৃ. ৬৪৮।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছিন্নপত্রাবলী', ১০৩ সংখ্যক পত্র।

৯। তবে নির্বাণই চরম ? তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী ? সে কি শূণ্যতা ?

যদি শূণ্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছানো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে, নয় নয় বলতে বলতে, একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই সেই সর্বশূণ্যতার মাঝে নির্বাণ লাভ করা যেত।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উল্টাপথ দেখি যে, তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছিনে – মঙ্গলের চেয়ে বড় জিনিসটি দেখছি যে। মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়। কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া। সে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই। সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা – সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ – তিনি নেন না। এই প্রেমের ভাবে, এই আদানহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধন প্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনা সংহরণের প্রণালী নয়। এতো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি।'

'ব্রহ্মবিহার' নামক ভাষণ, শান্তিনিকেতন, ১১ই চৈত্র, ১৩১৫, ।

১০। সুনীল চট্টোপাধ্যায় , 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ২১৭-২১৯।

১১। খ্রিস্টোত্তর পঞ্চম শতক থেকে ইংলণ্ডে অ্যাংলো-স্যাক্সন কাব্য কবিতা রচিত হতে থাকে। পুরোনো ইংরিজি ভাষা থেকে আধুনিক ইংরিজি ভাষায় সে সব কবিতা

অনূদিত হয়। 'THE EARLIEST ENGLISH POEMS' পেঙ্গুইন বুকস থেকে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। ভূমিকা এবং প্রচুর টিকাটিপ্পনী সহ অনুবাদ করেন Michael Alexander। ফ্রেঞ্চ, জর্মন বা রুশ ইত্যাদি ভাষায় পুরোনো দিনের কবিতাগুলিকে আধুনিক অনুবাদ করার চল ছিল। 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে।

১২। ঐ বক্তৃতা দুটি পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'পদচিহ্ন চর্যাগীতি' নামে বইটি এখনও পাওয়া যায়।

১৩। বীতশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা',বাণীশিল্প, , কলকাতা,১৩৮৮, পৃ. ৩৬। কাহ্নুর এই পদটি তিনি নিয়েছেন সুকুমার সেন বাবুর 'চর্যাগীতি পদাবলী' গ্রন্থের প্রকীর্ণচর্যা অংশ থেকে।

১৪। তদেব, পৃ. ১৬৪।

১৫। তারিখ নেই এমন একটি চিঠিতে বন্ধু প্রদীপ রায়গুপ্তকে লিখেছেন, 'গত কুড়ি বছরে আমি বলতে গেলে বিশেষ কিছু পড়িনি, লিখিও নি তেমন কিছু। যেটুকু পড়েছি তা ভারতবিদ্যা বিষয়ে, আর সে বিষয়েই আমার লেখার ইচ্ছে।' —

মানব চক্রবর্তী (সম্পাদিত)- 'জলার্ক', বীতশোক স্মরণ সংখ্যা, কলকাতা বইমেলা, ২০১৩,

এই চিঠির পূর্ব এবং পরের চিঠির তারিখ দেখে মনে হয়, চিঠিটি ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের কোনো একদিন বীতশোক ভট্টাচার্য তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন ।

১৬। বীতশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা', বাণীশিল্প,১৩৮৮, পৃ. ২৭।

১৭। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'জেন গল্প', বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৯৮৮, 'জেন কবিতা', অর্চনা, কলকাতা, ১৯৯০।

১৮। 'বাংলার সাহিত্যের শিক্ষকতা করেছি বলে বাংলায় যা কিছু নির্মিত হতে পারে, বিয়ের পদ্য আর গয়নার বিজ্ঞাপন, সে সমস্ত রচনার বরাত পেয়েছি। ছাত্রছাত্রী নিকৃষ্টমানের 'নোট'টুকু এনেছে, সংশোধন ও মার্জনা করেছি, তাদের কাছে নিষ্কৃতি পাইনি।

কারও কাছে মার্জনা চাইতে পারিনি; 'মাপ করবেন, লিখতে পারব না' বলাটা নিষ্ঠুর হবে মনে করেছি। কিন্তু 'না' বলতে না পারা মানুষের, বিশেষ করে রচয়িতা মানুষের, বোধ হয় ইতিবাচক দিক নয়। ... কলকাতা নামের সাহিতধানীর আকর্ষণ এড়িয়ে ভেবে ছিলাম 'জিতে গিয়েছি', কিন্তু মার এসেছে ভেতরের দিক থেকে। ফলে খিদে হয় না, ঘুম হয় না, স্বপ্ন দেখা হয় না, মনের মত গদ্য লেখা হয় না, প্রাণ ভরে কবিতা লেখা হয় না। কতকাল ধরে এই অশান্তির আতঙ্কের সঙ্গে ঘর করেছি, তা আর কি বলব। বিদেশি কোনো লেখক এমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে মনে হয় অনেক আগে মনোবিদের কাছে যেতেন। আমি জেন বা কৃষ্ণমূর্তির কাছে গিয়ে দেখেছি, মনোবল পাই কি না, একেবারে ধসে পড়েছিলাম, কবিতা না – এলে একেবারে ভেঙে পড়তাম। তবু মন্ত্রণা বলো, মন্ত্র বলো, নিজের কাছ থেকে নিতে হয়। কিছুতে কিছু হয় না প্রদীপ, যদি না আত্মদীপ হও।'

মানব চক্রবর্তী সম্পাদিত 'জলার্ক',বীতশোক স্মরণ সংখ্যা, প্রদীপ রায় গুপ্তকে লেখা চিঠি; তারিখ সেপ্টেম্বর ৫, ১৯৯৮, কলকাতা বইমেলা, ২০১৩, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

১৯। 'জেন' কবিতাটি 'নতুন কবিতা' গ্রন্থে প্রকাশিত ১৯৯২ সালে। পরে কবির 'কবিতা সংগ্রহ'-এ স্থান পায়। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা,২০০১ পৃ. ১৪৬।

২০। ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনূদিত), 'জাতক ১ম খণ্ড', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা,১৩৮৫, পৃ. ৪২।

২১। শান্তি পাদ – ১৫নং পদ (মূঢ়া উজুবাট - সংসারা); কাহ্নপাদ – ৪২নং পদ (মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর); কৌঙ্কণ পাদ – ৪৫নং পদ (সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ তা ভব মানই)। সুকুমার সেন মূঢ শব্দের অর্থ করেছেন মূঢ়া অর্থাৎ নির্বোধ, মূর্খ।

সুকুমার সেন,' চর্যাগীতি পদাবলী', আনন্দ, কলকাতা,১৯৯৫, পৃ. ২১৮-২১৯।

২২। 'ব্রহ্মবিহার' ১৩১৫ সালের ১১ চৈত্র, শান্তিনিকেতনে ভাষণ। দ্র: ১২৫তম রবীন্দ্র জয়ন্তী সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৩৯৫, পৃ. ৬৪৯।

২৩। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'জেন গল্প জেন কবিতা', বাণী শিল্প, কলকাতা,২০০৪, পৃ. ১৩-১৪।

২৪। চর্যার গানগুলিও হেঁয়ালির মতো। ঢেন্ঢন পা-র একটি কবিতা পড়লেই তা যে কারুর মনে হবে :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়িত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।।
বেগ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে যামায়।।
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহি এ এতিনা সাঁঝ্যে।।
জো সো বুধী সৌ ধনি বুধী।
জো যো চৌর সৌ দুষাধী।।
নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেন্ঢণ-পা এর গীত বিরলেঁ বুঝই।।

সুকুমার সেন, 'চর্যাগীতি পদাবলী', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫,পৃ. ৩৩।

২৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যার ভাষাকে — 'সন্ধ্যা ভাষায় মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না' — বলেছিলেন। সুকুমার সেন বিষয়টি আরো বিস্তৃত করে বলেন, 'যে ভাষায় বা যে শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয় (সম+ধ্যৈ), অথবা যে ভাষায় বা শব্দে অর্থ বিশেষভাবে নিহিত (সম+ধা) তাহাই 'সন্ধ্যা' (অথবা 'সন্ধা') ভাষা।'

তদেব, পৃ. ৩৩।

২৬। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন বুদ্ধদেব বসু। সে গদ্যে রবীন্দ্র অনুসারী কবিদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে এমন কথাগুলি বলেন। যা এখানে বীতশোক ভট্টাচার্যর কবিতার বিশেষ প্রকরণ বা ধরণ হয়ে গেছে।

বুদ্ধদেব বসু , 'সাহিত্যচর্চা', দে'জ, কলকাতা,১৯৫৪, পৃ. ১১৮

২৭। বুদ্ধ ও তাঁর সমকাল নিয়ে বীতশোক ভট্টাচার্য একটি উপন্যাস লেখেন ছাত্রাবস্থায়। সেই পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছেন তাঁর বন্ধু প্রাবন্ধিক ও চলচ্চিত্রকার ধীমান দাশগুপ্ত এবং

'পোস্টমডার্ন ও উত্তর আধুনিক' গবেষক নিতাই জানা। যদিও উপন্যাসটি আজও প্রকাশ পায় নি। তাছাড়া এম.এ. পাশের পর জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত 'কলকাতা ২০০০' পত্রিকায় প্রকাশ পায়, 'আমাদের প্রথম কবিতা : চর্যাগান: আধুনিক রূপান্তর' নামে। তাই বীতশোক ভট্টাচার্যকে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে দেখে যে কেউ তাঁকে বৌদ্ধ ভাবতেও পারেন।

২৮। 'বোধি' কবিতাটি 'প্রদোষের নীল ছায়া' কাব্যগ্রন্থে ২০০১ সালে প্রকাশিত। পরে 'কবিতা সংগ্রহে' স্থান পায়।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা,২০০১, পৃ.২২২।

২৯। বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন ধর্মানন্দ কোসম্বী। তাঁর গ্রন্থ 'ভগবান বুদ্ধ' (অনু: চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য) , সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লি,১৯৮০, পৃ. ৮৮-৯০।

৩০। তদেব পৃ. ৮৬।

৩১। তদেব পৃ. ৭৭-৭৮।

৩২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা,১৩৯০, পৃ. ১-৭।

৩৩। স্বামী বিদ্যারণ্য, 'বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২৫।

৩৪। বীতশোক ভট্টাচার্য,'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, পৃ. ২৪১-২৪২।

৩৫। অত্যন্ত প্রাঞ্জলকর এই তত্ত্ব বুঝিয়েছেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি' গ্রন্থে। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা,১৩৯০, পৃ. ২৪-২৫।

৩৬। এ বিষয়ে বাংলাভাষায় লেখা দুটি গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। ১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'লোকায়ত দর্শন',নিউএজ, কলকাতা, ১৯৬৯ এবং ২. দক্ষিনারঞ্জন শাস্ত্রী রচিত 'চার্বাক দর্শন', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৯।